Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-III, April 2023, Page No.01-08
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্র ছোটগল্পে যানবাহন: একটি সমীক্ষা

সুপ্তি ভট্টাচার্য
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Vehicles are the means of transport. Vehicles play an important role in the process of development of human civilization. Man with his unlimited needs changed his means of transport to mechanical vehicles from some animals used for communication in ancient age and consequently the civilization is also developed to this modern era. This change also affects the literature. Gurudev Rabindranath Tagore's thought is not an exception. Vehicles play an important role in Tagore's literature including short stories. Sometimes, these vehicles become a character in the theme of short stories. Vehicles are not only used to simply narrate the fact but to contol the central theme of the story. The present resume focuses on the role of vehicles in short stories of Rabindranath Tagore.

Key Words: Rabindranath Tagore, Short stories, Vehicles, Role of Vehicles, Metaphore

যান ও বাহন দুটি শব্দের অর্থই হল যাতে চড়ে যাওয়া যায়। সভ্যতার প্রাচীনকাল থেকে মানুষ শুধুমাত্র নিজের যাতায়াতের জন্য নয়, মালপত্র পরিবহনের জন্যও যানবাহনের ব্যবহার করেছে।মানবসভ্যতাকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যানবাহন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রাচীন প্রস্তর যুগেই মানুষ তৈরি করে ফেলেছিল মাছ ধরার নৌকা। পোষ মানিয়েছহিল কুকুর, ঘোড়া, গাধা, গরু প্রভৃতি জন্তুদের।এরপর চাকার ব্যবহার যানবাহনের ইতিহাসে দ্রুতগতিতে পরিবর্তন আনল।সম্ভবত চতুর্থ-পঞ্চম সহস্র খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে পশুতে টানা চাকাওয়ালা গাড়ির ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিল। যানবাহনের পরিবর্তনের দ্রুততার সঙ্গে মানবসভ্যতার ইতিহাসও দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হতে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই মানব সাহিত্যেও যানবাহন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

রবীন্দ্রসাহিত্যে যানবাহন অনন্য বনিয়াদের সূচক। রবীন্দ্রনাথের জীবনে নানা যানবাহনে চড়ার সুযোগ এসেছিল- যেমন ট্রেন, পুশপুশ,পালকি, ঘোড়ারগাড়ি, ফিটন এমনকি এরোপ্লেনেও চড়েছিলেন। এই যানবাহন রবীন্দ্র সাহিত্যের সর্বত্রই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। নাটক, কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ এমনকি গানেও অন্য মাত্রা এনেছে এই যানবাহন। রবীন্দ্র সাহিত্য নিবিড় ভাবে পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই যানবাহন রবীন্দ্র সাহিত্যে শুধুমাত্র বহিরাঙ্গিক উপাদান বা প্রত্যক্ষ বস্তুভার হয়ে থাকেনি, বরং হয়ে উঠেছে ঘটনার বিবর্তন ও কাহিনির পরিনতি নির্ধারণের এক অমোঘ শক্তি। কখনো কখনো যানবাহন

কেবলমাত্র যাতায়াতের মাধ্যম ছাড়া অন্য কিছু নয় একথাও বলে রাখা ভালো। এই যানবাহন কখনো কখনো চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের সহায়ক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিতে যানবাহনের ভূমিকা অনবদ্য। আর রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি এই যানবাহনের ভূমিকায় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রছোটগল্পে যানবাহনের ভূমিকা আলোচনা করার প্রসঙ্গটিকে চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে যথা রবীন্দ্রছোটগল্পে জলযান, রবীন্দ্রছোটগল্পে স্থলযান, রবীন্দ্রছোটগল্পে রেলগাড়ি, উপমা ও চিত্রকল্পে যানবাহন।

জলযান বলতে সাধারনত নৌকা, স্টীমার, বজরা, বোট, জাহাজ, স্টিমরোলার প্রভৃতিকে বোঝায়। নৌকা গুরুত্বপূর্ণ স্থানগ্রহণ করেছে। ঘাটের কথা, পোস্টমাস্টার, দালিয়া, একটি আষাঢ়ে গল্প, স্বর্ণমৃগ, ছুটি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, আপদ, দিদি, অতিথি, দুরাশা, অধ্যাপক, রাজটীকা, মণিহারা, দুর্বুদ্ধি, শুভদৃষ্টি, পাত্র ও পাত্রী, বলাই প্রভৃতি গল্পে।তৎকালীন বাংলাদেশে জমিদারি চালানোর জন্য থাকার সময় বেশির ভাগ সময় কেটেছে নৌকার উপর। নৌকা থেকে দেখেছেন তীরবর্তী জনজীবনকে। স্বাভাবিক ভাবেই এই ছোটগল্পগুলিতে নৌকার প্রভাব খুব বেশি।এই গল্পগুলিতে নৌকা কেবলমাত্র যান বা যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবেই প্রকাশ পায়নি কখনো হয়ে উঠেছে ঘটনার নিয়ন্তা, কখনো নৌকা একটি প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার হাতে কার্পেট ঝুলিয়ে কাঁধে ছাতা নিয়ে মুটের মাথায় নীল শ্বেতরেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলে দিয়ে ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চললেন। নৌকা ছেড়ে দিল।কিন্তু নৌকা ছেড়ে দেওয়ার পর বেদনা অনুভূত হয়ে লাগল। নৌকা ছাড়ার পরই মনে হল যাই ফিরে গিয়ে অনাথিনীকে নিয়ে আসি, কিন্তু তখন পালে বাতাস লেগে গিয়েছে। নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়েছে। তখনই এই ভাবনার উদয় হল "পৃথিবীতে কে কাহার"।[১] এই গল্পটিতে ছোটনৌকা ছাড়া অন্য কোন যান যথাযোগ্য ছিল না। গল্পের স্থানগত ও কালগত দিক থেকে নৌকাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত।আবার নৌকায় করে পোস্টমাস্টারের কোলকাতায় ফিরে যাওয়ার ঘটনা গল্পটির শেষ অংশকে যে স্থিতি দিয়েছে তা অন্য কোন যানের পক্ষে সম্ভব ছিল না।'ঘাটের কথা' গল্পে ঘৃতকুমারীর নৌকাকে কেন্দ্র করে নারীজীবনের করুণ কাহিনী ফুটে উঠেছে।

নৌকা ছাড়াও দ্বাদশতরীর উল্লেখ আছে 'একটি আষাঢ়ে গল্প' গল্পে।এই গল্পে সওদাগরের দ্বাদশতরী নদীতীরে প্রস্তুত ছিল। আবার সমুদ্রপারের দুখিনী দুয়োরাণী সোনার তরী চড়ে পুত্রের নবরাজ্যে আগমন করেছেন।'স্বর্ণমৃগ' গল্পে বৈদ্যনাথের বড়ছেলে অবিনাশ বাবার কাছে পূজার উপহার হিসাবে নৌকা চেয়েছে। বৈদ্যনাথ কতগুলি কাঠের খন্ড নিয়ে খুব সুন্দর দুখানি খেলনা নৌকা বানিয়ে সপ্তমীর পূর্বরাত্রে ছেলেদের উপহার দিয়েছে। স্ত্রী মোক্ষদার কাছে এর কোন গুরুত্বই নেই, আছে কেবলমাত্র স্বর্ণতৃষ্ণা।

স্টিমারের উল্লেখ আছে সমাপ্তি, রবিবার, মেঘ ও রৌদ্র গল্পে।'সমাপ্তি' গল্পে মৃন্ময়ীর বাবা ঈশান স্টিমার কোম্পানির কেরানি ছিলেন।মৃন্ময়ী ও অপুর্বর বিবাহের সময় "সে কোনো স্টিমার কোম্পানির কেরানিরূপে দূরে নদী তীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র স্টেশনে একটি ছোটো টিনের ছাদ বিশিষ্ট কুটিরে ওঠানো-নাবানো এবং টিকিট বিক্রয় কার্যে নিযুক্ত ছিলেন"[২] মৃন্ময়ীর বিয়ের সময়ও তার বাবা ছুটি পায় নি। মৃন্ময়ী ও অপূর্ব বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে কুশিগঞ্জের একটি স্টিমারঘাটে বাবার কাছে তিনদিন কাটায়। এই সময়ের হাসি আনন্দ পরবর্তীকালে মৃন্ময়ীর মনোজগতের পরিবর্তনে সাহায্য করে।মেঘ ও রৌদ্র গল্পের সপ্তম পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তাতে স্টিমার ও মহাজনী নৌকার পরস্পর রেষারেষিতে বিপুল ক্ষতি হয়

মহাজনী নৌকার। মহাজনী নৌকার একজন কর্মচারী মারা যায়। অথচ এতবড় ঘটনাতে নতুন লাইনের অল্পবয়স্ক ইংরেজ ম্যানেজার সাহেব খালাস পেয়ে যান কোন শাস্তি ছাড়াই।খুব নিখুঁত দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় স্টিমারটি যেন যন্ত্রনির্ভর ক্ষমতাদর্পী অন্যায়কারী ইংরেজ সভ্যতার প্রতীক। সাধারণ ইংরেজ পদদলিত ভারতীয় মানুষের দলে দাঁড়ায় মহাজনী নৌকাটি।'রবিবার' গল্পের সবশেষে অভীকের চিঠি আসে বিভার কাছে। গোটা গল্পের প্রেক্ষিতে শেষ চিঠিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই চিঠিতেই স্টিমারের ছাপ মারা অভীক জাহাজের স্টোকার হয়ে চলেছে বিদেশে। তার কাজ কয়লা স্টিমারে জোগানো।

জাহাজের উল্লেখ আছে- প্রায়শ্চিত্ত, অধ্যাপক, নষ্টনীড়, মাস্টারমশায় গল্পে।বোটের ব্যবহার আছে- নিশীথে মানভঞ্জন ও মণিহারায়।পান্সির ব্যবহার আছে- 'উদ্ধার' গল্পে। 'ল্যাবরেটরি' তে আছে স্টিমাররোলারের কথা। তবে শেষ পর্যন্ত 'ছুটি' গল্পে ফটিকের "একবাঁও মেলেনা। দো বাঁও মেলে-এ-এ না"[৩] জলমাপার এই নৌকাভাষা আমাদের অনন্তলোকের অমাপ্য নৌকাযাত্রার কথা মনে করায়।

স্থলযান বলতে মোটরগাড়ি, ঠেলাগাড়ি, পালকি, গোরুরগাড়ি, জুড়িগাড়ি, রেলগাড়ি, ঠিকাগাড়ি, বাইসাইকেল, ট্রাম, ঘোড়ার গাড়িকে বোঝানো হয়।গাড়ির কথা আছে- বিচারক, ফেল, মাল্যদান, কর্মফল, স্ত্রীরপত্র, ভাঁইফোটা, নষ্টনীড়, তপস্বিনী, নামঞ্জুর, সংস্কার, পাত্রপাত্রী প্রভৃতি গল্পে।

'দালিয়া' গল্পে চারিদিকের রাজনৈতিক তীব্র দ্বন্দ্ব ও প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবৃত্তি এর মাঝে স্বর্ণমন্ডিত শিবিকায় জুলেখা ও আমিনা এসেছে রাজদরবারে। শিবিকাদুটি তোরণদ্বার অতিক্রম করে অন্তঃপুরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যেন হিংস্রতার উপর প্রেমের জয় স্থাপিত হয়েছে। 'বিচারক' গল্পে জজ মোহিতমোহন দত্ত ক্ষী্রোদাকে জীবনের পঙ্কিল গর্তে নামাবার চেষ্টায় সফল হয়েছিলেন একটি গাড়ীর মাধ্যমে। 'রবিবার' গল্পে অভীকের দুটো শখের একটি হল কলকারখানায় জোড়াতাড়া দেওয়া। আসলে অভীকের বাবার তিনটি মোটরগাড়ি ছিল। এগুলি ছিল তার মফঃস্বল অভিযানের বাহন। অভীকের যন্ত্রবিদ্যার হাতেখড়ি এখান থেকেই। অন্যদিকে অভীকের একটি ঢিলেঢালা ফোর্ড গাড়ি আছে। আর আটশ টাকা দিলে ওর বাপদাদার বয়সী একটি পুরোনো ক্রাইসলার পাওয়া যেতে পারে। তাই সে বিভাবরীর কাছে আসে টাকা সংগ্রহের চেষ্টায়। এই গাড়ি কেনার কথাতেই অভীক ও বিভার মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রেম পরিস্ফূট হয়েছে। 'শেষ কথা' গল্পটির কথক দীক্ষা নিয়েছে যন্ত্রবিদ্যায় ডেট্রয়েটে মোটরকারখানায়। 'পয়লানম্বর' গল্পে ট্রামের বিবরণ আছে।এই গল্পের সিতাংশুমউলির সঙ্গে অদ্বৈতচরণের প্রথম আলাপ গাড়ি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেদিন সিতাংশুমৌলি একটা খোলা ব্রুহাম গাড়ির একজোড়া লাল ঘোড়া কে নিজেই হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' গল্পে বরযাত্রীদের সুবিধার জন্য যজ্ঞেশ্বর আশপাশের গ্রাম থেকে ছইওয়ালা গোরুর গাড়ি জোগাড় করে রেখেছিলেন, কিন্তু তার কপাল মন্দ। বিয়ের দুদিন আগে থেকেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবেই বরযাত্রীরা কাদাময় রাস্তার উপর গোরুর গাড়িতে বসতে গিয়ে ভীষণ বিরক্ত হয়েছে কন্যাপক্ষের উপর। বর্ষাকালীন গ্রামের রাস্তাঘাটের পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে গোরুর গাড়ির ব্যবহার।

'মাস্টারমশাই' গল্পে অতিপ্রাকৃত আবহের সৃষ্টি করা হয়েছে। সারাগল্প জুড়ে ছাত্র বেনুগোপাল এর উপর অকৃত্রিম স্নেহ ও বন্ধুত্ব প্রকাশিত হয়েছে। মাস্টারমশায় নিজের জীবনের মূল্যে বেনুগোপাল কে রক্ষা করেছেন। ছাত্র চুরি করলেও চুরির দায়ে ধরা পড়েছেন মাস্টারমশায় । চারিদিকের পরিস্থিতির চাপে পড়েও ছাত্রটিকে ধরিয়ে দিতে পারেন নি। বেনুগোপাল মায়ের গয়না চুরি করে মাস্টারমশায়ের অজান্তে তার

বাড়িতে দিয়ে যায়। বিনিময়ে নিয়ে যায় মাস্টার মশায়ের ঘরে রাখা কোম্পানির গচ্ছিত টাকা। শেষপর্যন্ত হরলাল গয়নাভর্তি ব্যাগ ফিরে দেয় বেনুগোপালের বাবার কাছে, পরিবর্তে তাকে সাহায্যটুকুও করেন না।অসহায় মায়ের জন্য তীব্র কষ্ট বুকে নিয়ে, অসম্মানিত অবস্থায় শেষ পর্যন্ত অত্যধিক দুশ্চিন্তায় চলমান ঠিকাগাড়ির ভিতরের মারা যায় হরলাল। বেনুগোপাল হরলালের প্রতি তীব্র অন্যায় করে বিলাতে গিয়েছিল। সেখানেও সে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি। ফিরে এসেছে মদ্যপ মাতাল হয়ে প্রায় তিন বছর পর। এখানেই ঘটনাচক্রে ঐ ঠিকাগাড়ি চেপে বেশিরাত্রে বাড়িফেরার সময় মাস্টার মশায়ের অনির্দেশ্য চাহনির কথা মনে পড়ে যায় বেনুগোপালের। ভাড়াটে গাড়ির মধ্যে হরলালের অনির্দেশ্য চাহনি যেন বেনুগোপালের অবচেতন মন। তার অন্তরের অন্যায়বোধের একমাত্র সাক্ষী ভাড়াটে গাড়িটি। গাড়ির ওই নির্জনতা ছাড়া তিনবছর আগে বেনুগোপালের করা অন্যায়ের সামান্য পরিমান প্রতিবাদ করা সম্ভবপর ছিল না।

'পণরক্ষা' গল্পে বংশীবদন ও রসিক দুইভাই।দুজনের পণ বাইসাইকেল। ভাইয়ের শখ রক্ষার জন্য বংশীবদন জীবনপণ করেছে। অন্যদিকে রসিকও যেনতেন প্রকারে বাইসাইকেল নেওয়ার জন্য ঘর ছেড়ে চলে যায়। তবে দুই ভাইয়ের মধ্যে পার্থক্য বংশীবদন কাজের মর্যাদা বোঝে ও বংশগৌরব খাটো করতে রাজী নয়। রসিক বংশমর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় ও পরশ্রমে একেবারে বিশ্বাসী নয়। বংশগৌরব ও দাদার কথা চিন্তা না করেই বিয়ে করে নেয় রসিক। বিয়ের উপহার হিসাবে বাইসাইকেল চেয়ে বসে। সাইকেল চালিয়ে রসিক বাড়ি ফিরে এসে দেখে দাদা তার বিয়ের জন্য কন্যাপণের টাকা আর রসিকের বাইসাইকেল কিনে দিয়ে মারা গেছে।

'নষ্টনীড়' গল্পে নাটকীয় মোর এনে দিয়েছে গল্পের শেষে গোরুর গাড়িটি। চারুর অনুরোধে ভূপতি চুঁচড়োয় শ্যালীর বাড়ি যাওয়ার পথে স্টেশনে যায়। তখনই এক সার গোরুর গাড়ি হঠাত তার গাড়ি আটক করে । এমন সময়ে পরিচিত হরকরা ভুপতিকে দেখতে পায় এবং তার হাতে একখানা বিলাতের টেলিগ্রাফ দেয়। বিলাতের টেলিগ্রাম দেখে ভূপতি ভয়ে ভয়ে খুলে দেখে লেখা আছে 'আমি ভালো আছি'।[৪] এরপর বিষয় আর গোপন থাকে না যে চারু নিজের গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করে অমলকে টেলিগ্রাম করেছিল। ভূপতির সঙ্গে চারুর সম্পর্কের চরম অবনতি হয়। 'কঙ্কাল' গল্পেও ডাক্তার শশিশেখরের সঙ্গে তার বন্ধুর ভগ্নীর প্রেমের সম্পর্ক চলেছে। ডাক্তার টাকার লোভে বিয়ে করতে চলেছেন কিন্তু প্রেমিকাকে কিছু জানাননি। প্রেমিকার দাদার কাছে তার জুড়িগাড়িটি ধার চেয়েছেন। এতেই আসল বিষয়টি প্রকাশ পায়। শেষপর্যন্ত প্রেমিকা ডাক্তারবাবুর পানীয়ে বিষ মিশিয়ে হত্যা করে ও নিজেও আত্মহত্যা করে। রেলগাড়ির বিবরণ আছে- স্বর্ণমৃগ, মেঘ ও রৌদ্র, ক্ষুধিত পাষাণ, দুরাশা, রাজটিকা, নষ্টনীড়, রাসমনির ছেলে, স্ত্রীর পত্র, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা গল্পে।

'স্বর্ণমৃগ' গল্পে স্ত্রীর স্বর্ণতৃষ্ণায় বৈদ্যনাথ সমস্ত খুইয়েছেন।গুপ্তধন পাওয়ার আশায় সর্বস্ব হারান তিনি। এরপর প্রাণটুকু সম্বল করে গ্রামে ফিরে এলেন। তার বাড়ি ফেরার ইচ্ছা খুব একটা ছিল না। তবে একদিন এই পূজোর ছুটিতে প্রবাসীদের বাড়ি ফিরে আসার ঘটনা তার মনে লালসার উদ্রেক করত।আজ তিনিও গাড়ি করেই ফিরে আসছেন কিন্তু কোন আনন্দ নেই।গল্পের সুবাদে বিষয় টি খুবই গুরুত্বপুর্ণ।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের অষ্টম পরিচ্ছেদে শশিভূষণ কোলকাতায় যাওয়ার সময় রেলপথে না গিয়ে বরাবর নদীপথে যাওয়াই স্থির করলেন। গল্পের খাতিরে দেখা যায় নদীপথে যাওয়ার জন্যই শশিভূষণের

জীবনে ভোগান্তির সীমা ছিল না। তবে সাবধানী পাঠকের মনে হয় যদি শশিভূষণ নদীপথে না গিয়ে রেলপথে যেতেন তা হলে হয়ত এসব এড়ানো যেত।

বাস্তবে রবীন্দ্র জীবনে রেলভ্রমণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই রেলের রাত্রিতে ঘুমের আধোচেতনে তিনি কখনো কোন গল্পের পটভূমি পেয়েছেন কখনো নাটকের চিত্রপট আবিষ্কার করেছেন।'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটিতে গল্পকথক ও তার আত্মীয় পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণ সেরে কোলকাতায় ফিরে আসার সময় রেলগাড়িতে বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়।এই ব্যক্তিটির সর্বব্যাপী জ্ঞানে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েন। গাড়িটি জংশন স্টেশনে এসে থেমে যায়, দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ওয়েটিং রুমে বসে থাকার সময় প্রায় রাত দশটায় উক্ত ব্যক্তিটি এক গল্প ফেঁদে বসেন।গল্পের অবতারণায় রেলগাড়ির ভূমিকা অনবদ্য। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মেজবৌ বিন্দুকে সমস্ত কিছু থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তাই শরৎ কে ডেকে বিন্দুকে তাদের সঙ্গে পুরী যাওয়ার গাড়িতে তুলে দিতে বলে কিন্তু তার আগেই বিন্দু কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে। এখানে রেলগাড়ি মুক্তপথের দিশারী।

'জীবনস্মৃতি' পড়ে আমরা জানতে পারি উপনয়নের পর বালক রবীন্দ্রনাথ প্রথম রেলগাড়ি চেপেছিলেন পিতৃদেবের সঙ্গে।ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ রেলে ওঠার সময় রবীন্দ্রনাথকে কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন রেলগাড়িতে চাপার ভয় থাকলেও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস সবগুলিতেই রেলগাড়ির ভূমিকা অনন্য।রেলগাড়ি ঘটনার নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে উঠেছে 'চোখের বালি' উপন্যাসে।

'অপরিচিতা' গল্পে অত্যধিক পণের কারণে নায়কের বিয়ে নাকচ হয়ে যায় কন্যাপক্ষের কাছ থেকে। রূপ গুণ অর্থ সব দিক থেকে লোভনীয় পাত্র হয়েও কন্যাপক্ষের কাছে প্রত্যাখাত হওয়ার ঘটনা খুবই নতুন নায়ক ও নায়কের পরিবারের পক্ষে।এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য নায়ক তার মাকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছে। রেলগাড়ির আলো আবছায়াময় পরিবেশে আধঘুমোনো অবস্থায় হঠাৎ শুনতে পেলেন "শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে"।[৫] সম্পূর্ণ অবাঙালি পরিবেশে বাঙালি মেয়ের গলা তাকে মায়াবি জগতে টেনে নিয়ে গেল । পরদিন সকালে একটি বড় স্টেশনে গাড়ি বদল করার সময় ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট থাকা স্বত্তেও অত্যধিক ভিড়ের কারণে উঠতে পারলেন না । এইরকম বিপন্ন অবস্থায় একটি সেকেন্ড ক্লাসের গাড়ি থেকে একটি মেয়ে তার মাকে লক্ষ্য করে বলল "আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না –এখানে জায়গা আছে"।[৬] এরপরে আবার অন্য একটি বড় স্টেশনে একজন ইংরেজ সাহেব তাদের জোর করে নামিয়ে দিতে চায়। গল্পের নায়ক ভয় পেয়ে যান। কিন্তু মেয়েটি যথাযথ যুক্তির সাহায্যে ইংরেজ সাহেবদের তাড়াতে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে জানা যায় এই মেয়েটিই সেই মেয়ে যার সঙ্গে নায়কের বিয়ে স্থির হয়েছিল। নায়ক তার ভুল বুঝতে পার। কন্যাপক্ষের ভুলভাঙার জন্য এবং কন্যাপক্ষের মনজয় করার জন্য এলাহাবাদে এসে বসবাস শুরু করে। পুরো গল্পটিকে ঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গল্পটির দুটি বিভাগ। প্রথম অংশে গল্পের কথক এর বিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছে এবং পাত্রপক্ষের সবাই কন্যাপক্ষের উপর খুব বিরক্ত। বিয়ে বাড়ির বিরাট গন্ডগোলের মধ্যে কন্যাটি কিন্তু সবার আড়ালে থেকে গিয়েছে। পরের অংশে সব অভিমান ত্যাগ করে নায়ক এসেছেন কন্যা ও তার পিতার কাছে। এমনকি স্বকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। ক্ষমা পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করে চলেছেন। দুটি অংশের যোগসূত্র রেলগাড়ি। রেলগাড়ির ঘটনাতেই সেদিনের অপরিচিতা বিশিষ্ট রূপে পরিচিতা হয়ে উঠেছেন। ঠিকভাবে বলতে গেলে রেলগাড়ির ঘটনাটি না ঘটলে গল্পটির এমন সুন্দর পরিণতি হতে পারত না। গোটা গল্পটিতেই

রেলগাড়ি প্রধান সূত্রসঞ্চালক, এমনকি ঘটনার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে রেলগাড়ি ।ক্ষুধিত পাষাণ, অপরিচিতা প্রভৃতি গল্পে রেলগাড়ির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এছাড়াও করুণা, যোগাযোগ প্রভৃতি উপন্যাসে রেলগাড়ি যেন চরিত্র হয়ে উঠেছে।

যানবাহনের ব্যবহার রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে অন্যমাত্রা যোগ করেছে।নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি জলযান কখনো কখনো বাস্তব জীবনের কেবলমাত্র পারাপার হওয়ার মাধ্যম হয়ে ওঠেনি, হয়ে উঠেছে জীবনতরীর সমধর্মী। আবার রথ যেন একটি অপূর্ব চিত্রকল্প হয়ে ধরা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্প বা উপন্যাসে। এক্ষেত্রে 'মুসলমানীর গল্প'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'রামকানাই-এর নির্বুদ্ধিতা' গল্পে স্ত্রীপুত্রের কুকর্মের কথা শোনার পর রামকানাই এর অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন এই রকম – "বোঝাই গাড়ি সমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও যেমন নিরুপায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে রামকানাই তেমনি অনেক্ষণ সহ্য করিলেন"।[৭] মানুষের অবস্থার সঙ্গে খাদে পড়া বোঝাই গাড়ির উপমা অসাধারণ হয়েছে।

'শাস্তি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুখীরাম ও ছিদাম দুই ভাই-এর জীবনের এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন যান বাহনের উপমার মাধ্যমে। "তাহারা দুইভাই যেন দীর্ঘ সংসার পথ একটা এক্কা গাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুইদিকের অবিশ্রাম ছড়ছড় খড়খড় শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধি বিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে"।[৮] এমনকি চন্দরার শরীরের গঠন বর্ণনার ক্ষেত্রেও নৌকার উপমা ব্যবহার করেছেন। "এক খানি নূতন তৈরি নৌকার মতো ; বেশ ছোটো এবং সুডোল , অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই"।[৯] 'আপদ' গল্পে শরৎবাবু ও কিরণময়ীর বাদ-প্রতিবাদ এর বিবরণ উপলক্ষে শরৎবাবুর অবস্থা কেমন তার তুলনা দিয়েছেন কর্ণহীন নৌকার সঙ্গে। "কর্ণহীন নৌকার মত ক্রমাগতই ঘুর খাইয়া মরিতেছিল; অবশেষে অশ্রুতরঙ্গে ডুবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল"।[১০] 'দানপ্রতিদান' গল্পে শশিভূষণ এর দ্রুতগতিতে যৌবন থেকে প্রৌঢ় বয়সে অতিক্রমের কথা আছে। এই প্রসঙ্গে রেল গাড়ির দ্রুতগতির তুলনা করেছেন "দশ বৎসর পূর্বে শশিভূষণ যৌবনের সর্ব প্রান্তে প্রৌঢ় বয়সের আরম্ভভাগে ছিলেন কিন্তু এই আটদশ বৎসর এর মধ্যেই তিনি যেন অন্তরুদ্ধ মানসিক উত্তাপের বাষ্পযানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্ধক্যের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন"।[১১] 'পয়লা নম্বর' গল্পে রূপক অলংকারের ব্যবহার করেছেন যানবাহনের অনুষঙ্গে ।যেমন মানসরথ যাত্রার গাড়িখানা, আধুনিকতার এক্সপ্রেস গাড়ি, ইবসেন মেটারলিঙ্ক নামের নৌকা। মনুষ্যেতর প্রাণীকে নিয়ে উপমার ব্যবহার করেছেন 'পাত্র ও পাত্রী' গল্পে- "ঘোড়া যখন তার পিছনের গাড়িটাকে অন্যায় মনে করে তার উপরে লাথি চালায় তখন অন্যায় টা তো থেকেই যায় মাঝের থেকে তার পা কেও জখম করে"।[১২]

'একটি আষাঢ়ে গল্প' গল্পের শেষে "সমুদ্র পাড়ের দুঃখিনী দুয়োরানী সোনার তরীতে চড়িয়া পুত্রের নবরাজ্যে আগমন করিলেন"।[১৩] আর এই সোনার তরীর স্পর্শে ছবির দল হঠাৎ মানুষ হয়ে উঠল, ঘা লাগল নীরবতার বুকে।

'অসম্ভব কথা' গল্পে বর্নিত শিশুটি বাস্তবকে মেনে নিতে চায়না, কল্পরাজ্যের আবেশ থেকে সে রেরোতে পারে না।তাই রাজকন্যার বর মারা গেলে জিজ্ঞাসা করে- "তারপরে কী হইল"।[১৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মৃত্যুর মধ্যে জীবনের জয়ধ্বনির মতো অসম্ভব কথা বোঝাতে চেয়েছেন কলার ভেলার অনুষঙ্গ

ধরে। এখানে যেন বেহুলা লখীন্দরের কথা উঠে এসেছে— "কেবল হয়তো একটা কলার ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া গুটি দুই মন্ত্র পড়িয়া মাত্র……"।[১৪]

যানবাহনের আবির্ভাব মানব সভ্যতার ঊষা-লগ্ন থেকে।মানুষ যত এগিয়েছে সে নিজের প্রয়োজন মেটাতে গড়ে নিয়েছে নানাবিধ যান। তার নিজের সৃষ্টি তাকে দিয়েছে গতি। সময় ও দূরত্ব কে জয় করার অদম্য ইচ্ছাতে মানুষ প্রায় প্রতিদিনই তার সৃষ্ট যানের নানাবিধ পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাই ভেলা-নৌকায় যার সূচনা তা এখন অন্তরীক্ষে। মানুষের চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেমন রকমারি যানের উদ্ভব তেমনই যানের সঙ্গে সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে লেখককুলের কৌতূহলও বেড়েছে। তাই অনিবার্য ভাবে সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছেো। সাহিত্যিকরা নানা রচনায় যান ও মানুষের আন্তঃসম্পর্কের খোঁজে তন্নিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন। কথাসাহিত্যের নিবিড় পর্যবেক্ষণে আমরা দেখি, যান তাঁর সাহিত্যে শুধুমাত্র নিছক বস্তুমাত্র হয়ে থাকেনি বরং সর্বক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে গল্প-উপন্যাসের চালিকা শক্তি।ছোটগল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ এর মনোজগতের ছবি বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে ।প্রতিটি দিক নিখুঁত ভাবে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে যানবাহন।

তথ্যসূত্র:

১. গল্পগুচ্ছ অখণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ: ২১।
২. তদেব, পৃ: ১৭৯
৩. তদেব, পৃ: ১২৮
৪. তদেব, পৃ: ৪৫৩
৫. তদেব, পৃ: ৬৫৯
৬. তদেব, পৃ: ৬৬০
৭. তদেব, পৃ: ২৬
৮. তদেব, পৃ: ১৬৫
৯. তদেব, পৃ: ১৬৮
১০. তদেব, পৃ: .২৫০
১১. তদেব, পৃ: ১৪৩
১২. তদেব, পৃ: ৬৮৯
১৩. তদেব, পৃ: ৮৭
১৪. তদেব, পৃ: ১৬৪

সহায়ক গ্রন্থ:

১. রবিজীবনী, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ, ১৪২৩।
২. রেল উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সাহিত্যে, রমেনকুমার সর, দে'জ পাবলিশিং, ১৪২৬।
৩. রেল ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, মিত্র ও ঘোষ, ১৪২৩।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাত্রী আমি, সংকলন ও সম্পাদনা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০১১।
৫. রবীন্দ্রজীবনকথা, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ, ১৪২৫।